ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 395- 404
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.222

জাওয়া-করম উৎসব: সামাজিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

রঞ্জিত কুমার মাহাত, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই. বি. এন. ইউনিভার্সিটি, রাঁচি, ঝাড়খন্ড , ভারত*
ড. চন্দ্র শেখর হালদার, *তত্ত্বাবধায়ক ও সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই. বি. এন. বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খন্ড, ভারত*

Received: 26.10.2025; Accepted: 26.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The information was introduced approximately 10 to 15 years ago. The journey of man was also initiated. But social scientists do not have specific evidence as to who or where this historical event occurred. The people of the southwestern border region of Bengal commemorate the memory of that past event of sprouting from a seed, a very amazing and significant event, through their Jawa-Karam festival. According to scientists, women invented agriculture at some point in the past. The role and presence of women in the Jawa-Karam festival also proves this. Not only that, but agriculture and culture also began from this agriculture. This is what human scientists say. The language, literature, music, and dance of Jawa-Karam Geet still retain many memories of that initial phase. There has been no valuable study or research on the Jawa-Karam festival and its rituals to this day. There is no doubt that when the matter is brought to light, all those historical truths will be revealed.

Keywords: Jaowa, Karam, Karam song, Jaowabera, karmati, Stage, Jaowa song and dance

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা লোকসংস্কৃতির এক আশ্চর্য খনি গর্ভ। যে খনি গর্ভ ভরপুর হীরা, মুক্তা, মনি, সোনার মত মহামূল্যবান লোকসংস্কৃতির আকরিক উপাদান দিয়ে। এই সাংস্কৃতিক রত্ন গুলি আদিম, অকৃত্রিম এবং ভারতের প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির ঐতিহ্যের গরিমায় মন্ডিত, উজ্জ্বল আলোতে আলোকিত। যার সীমাকে যেমন লোকায়ত সীমায় বাঁধা যায় না, তেমনি নির্দিষ্ট সময়ের সীমাতেও বাঁধা কঠিন। প্রখ্যাত গবেষকগণ এই সংস্কৃতিকে ঝাড়খন্ড সংস্কৃতি, ছোটনাগপুর তথা রাঢ়ের সংস্কৃতি, মানভূম সংস্কৃতি এবং আজকের দিনের অভিধায় পুরুলিয়ার সংস্কৃতি, ঝাড়গ্রাম সংস্কৃতি সুবর্ণরৈখিক সংস্কৃতি, অথবা উত্তর উড়িষ্যার সংস্কৃতি বলে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখায় আবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তা বিবাদের উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। যুক্তি বার বার খন্ডিত হয়েছে অপর যুক্তির কাছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা অভিধাটিও অবশ্যই এর উর্ধ্বে নয়। তবে তা গবেষণাকে চিহ্নিত করার একটি উপায় বা অবলম্বন মাত্র।

সাম্প্রতিক গবেষণায় গবেষকগণ মনে করেছেন এই সংস্কৃতি ভারতের প্রাগ-ঐতিহাসিক সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পরম্পরা সঞ্জাত একটি জীবন্ত রূপ। কেবল বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি, কিরীটি মাহাত, সৃষ্টিধর বঁশরিআর, অনাদী মাহাত সহ বহু গবেষক এই কৃষি সংস্কৃতিকে মানব সভ্যতার বিকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে ওতোপ্রোত জড়িত বলেই দাবী করেছেন। এই দাবীর পিছনে যে লোক উৎসবটি প্রধান আলোচ্য বিষয় তা হলো ‘জাওয়া-করম’ উৎসব। গবেষকগণের দাবী এই জাওয়া-করম হলো মানব সভ্যতার একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি। যা ঘটেছিল কমপক্ষে

১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ বৎসর পূর্বে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি হলো কৃষির আবিষ্কার। আর এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই মানুষ একদিন অরণ্য জীবন ও পশুপালন থেকে কৃষি সভ্যতার সূচনা করেছিল। বলা যায় তাই ছিল মানব সভ্যতারও সূচনা। আমরা নিবন্ধে দেখে নেব জাওয়া-করম উৎসবের ঐতিহাসিক সামাজিক এবং সেই আধ্যাত্মিক তাৎপর্যটির পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপটি, মানব সভ্যতার প্রাথমিক পর্বের কৃষির আবিষ্কার, কে বা কারা করেছিল? অথবা সেটি কোথায় ঘটেছিল, বা আজকের দিনে তার প্রকৃত ধারক বা বাহকই বা কারা, এই সকল প্রাথমিক ও মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পাঠক খুঁজে পাবেন এই নিবন্ধে। কেবল কি তাই? এই নিবন্ধ থেকে গবেষকগণ খুঁজে পাবেন লোক সংস্কৃতি গবেষণারও কিছু মৌলিক সূত্র। লোক সংস্কৃতি কেবল 'লোক' এর সংস্কৃতি নয়, তা একটি ভূখন্ডের সংস্কৃতিও বটে। তাই তার শিকড় থাকে মাটির অনেক গভীরে। তাই মূল ধারার সংস্কৃতি থেকে লোক সংস্কৃতিকে পৃথক করে দেখা কতখানি ভ্রান্তি তা এই নিবন্ধ প্রমাণ করবে। যা এতদিন গবেষণার জগতে ঘটে চলেছে।

জাওয়া-করম শব্দটির পরিভাষা, অর্থ ও তাৎপর্য:

উৎসবটির প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলে এর নামকরণ ও জাওয়া-করম শব্দ দুটির বুৎপত্তি অর্থ ও তাৎপর্যটি প্রথমেই অনুধাবন করা জরুরী। উৎসবটি ভারতবর্ষের বিস্তৃত ভৌগোলিক ক্ষেত্র জুড়ে প্রচলিত থাকায় নামকরণের ক্ষেত্রেও এর পারিভাষিক শব্দ গুলির ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। অঞ্চলভেদে উৎসবটি জাওয়া পরব, করম পরব, ছেল্যা পরব, আবার জাওয়া করম পরব নামেও কথিত হয়ে থাকে। আবার শব্দটি 'জাওয়া' নাকি 'যাওয়া' এ নিয়েও পন্ডিত মহলে বিবাদ রয়েছে। এই বিষয়ে ড. সুধীর কুমার করন এবং ড. বঙ্কিম মাহাত 'জাওয়া' শব্দটির পক্ষে হলেও প্রবীণ ও প্রাতঃ স্মরণীয় গবেষক ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি শব্দটিকে 'যাওয়া' বলে অভিহীত করার পক্ষে মত দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ঝাড়খন্ডী লোক ভাষার গান' গবেষণা গ্রন্থে বলেছেন-

> "শস্যের সমৃদ্ধির কামনার গুঢ় আবেদনই এই গানের উৎস কি না তা নির্ভুলে নির্ণয় করা কঠিন। অনুষ্ঠান সাক্ষ্য দিলেও গানের সূত্র খুঁজে এমন সিদ্ধান্তে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায়েই নেই।"[১]

তবে বক্তব্যকে প্রাণ পেতে শুনলে এগুলি 'যাওয়ার' গান। পরিচিত পিতৃ গৃহ থেকে স্বাজনহীন স্বামী গৃহের দূর দেশে যাওয়ার বিষন্নতা এদের চোখে মুখে মাখা। অধিকাংশ গানেই আছে বধূ জীবনের কথা ও ব্যথা।

জাওয়া-করম অবিবাহিত মেয়েদের পরব। কিন্তু সদ্য বিবাহিত মেয়েরাও এই পরবে বাপের বাড়িতে যাই ও করম পরবে সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে নাচে গানে ভাগ নেই। এইটিই এই অঞ্চলের রীতি। তাই ভাদ্র মাস পড়লেই মেয়েদের মনে বাপের বাড়ি যাওয়ার বাসনা মনে দানা বাঁধে। মনের গোপনে প্রতিদিন তারা প্রতীক্ষায় থাকে দাদা কখন তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আসবে। উৎসবের এক দু'দিন পূর্বেই দাদা এসে যায়। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ি বা স্বামীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে তার বাপের বাড়ি যাওয়া সম্ভব হয় না। গীতেও রয়েছে সেই না যাওয়ার বেদনার কথা--

গীত:

> "ইঁদ-করম লইজকাল্য দাদা আল্য লিতে গো
> শাশুড়ী-ননদী বাদী নাই দিল যাতে।"[২]

ড. সাহা হয়ত এই 'যাওয়া' প্রসঙ্গটি থেকেই জাওয়া-করম উৎসবটির তাৎপর্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন। আসলে কুড়মালি 'জাওয়া' শব্দের অর্থ-তাৎপর্য প্রকৃত ভাবে না জানা থাকায় এই বিভ্রান্তি। আর বিভ্রান্তি পুরো উৎসবটির অর্থ ও তাৎপর্যকেই সম্পূর্ণ ভুল পথে পরিচালিত করে।

ড. বঙ্কিম মাহাত, ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহার বক্তব্যকে অন্তত যুক্তির সঙ্গেই খন্ডন করেছেন। 'ঝাড়খণ্ডের লোক সাহিত্য' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেছেন,

> "জাওয়া পরব একটি শস্য উৎসব। জাওয়া শব্দটি 'জাত-ক' শব্দ থেকেই উৎপন্ন। তবে 'জাওয়া' না 'যাওয়া' এ নিয়েও মতভেদ আছে। এ গানে 'যাওয়ার' কোথাই প্রাধান্য পেয়েছে এ কথা ঠিক। তবে ড. ধীরেন্দ্রনাথ সাহা যে পিতৃ গৃহ থেকে শ্বশুরালয়ে 'যাওয়ার' কথা বলেছেন মনে হয় তা ঠিক নয়। আসলে ভাদ্র মাসে করম পরবে ঝাড়খণ্ডের শ্বশুর গৃহে বন্দিনী বধূরা পিতৃ গৃহে যাবার ছাড়পত্র পেয়ে থাকে; অবশ্য সব সময়েই যে অনুমতি পেত, তা নয়। নব বিবাহিতা বধূরা ইঁদ করমের দিন গুনে শশুরালয়ে সব দুঃখ কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করে প্রতীক্ষা করে থাক।"[৩] (পৃ-৫৭)

ড. মাহাত জাওয়া শব্দটির তাৎপর্যে 'জাত-ক' শব্দের প্রসঙ্গটি এনেও ড. সাহার 'যাওয়ার' প্রসঙ্গটিকেও মান্যতা দিয়েছেন। আসলে 'জাত-ক' ঘটনাটি আসল এবং এই 'জাত-ক' বা জাওয়া পাতাকে উপলক্ষ করে কোন বিবাহিত মেয়ের বাপের বাড়ি আসার ঘটনাটি এই উৎসবের একটি সামাজিক রীতি বা আচার মাত্র। এই উৎসবের মূল তাৎপর্যটি যাওয়া বা আসা নয়। মূল জাওয়ার ক্রিয়াটি আমাদের বিবেচ্য হওয়া উচিত। অবশ্য ড. মাহাত এরপর আরও বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচনায় বলেছেন-

> "জাওয়ার উপকরণ থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, এ অনুষ্ঠান অঙ্কুরোদগমের অনুষ্ঠান। জাওয়া শস্য কামনার উৎসব, উর্বরতা বাদ বা Fertility cult এর মুখ্য পরিচয়।"[৪] (পৃ-৫৭)

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সংস্কৃতি গবেষকদের মধ্যে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ড. সুধীর কুমার করনের অভিমত ও যুক্তিটি প্রায় অনুরূপ। 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন-

> "ধলভূম, মানভূম, ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে করম পূজার যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তাতেও শস্যোৎপাদন প্রক্রিয়ার অগ্রাধিকার। উৎসবের কয়েকদিন পূর্বেই মেয়েরা নদী বা খাল থেকে বালি নিয়ে আসে। সেই বাড়িতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় পঞ্চ শস্য। কোন কোন অঞ্চলে আরো বেশি শস্য বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হয় এবং অপেক্ষা করা হয় চারা গাছের জন্ম লগ্নের জন্য। মানভূমের এই অনুষ্ঠান রীতির নাম 'জাওয়া'।.....বলা বাহুল্য জাওয়া মানেই জন্ম, জাত। এই জাওয়ার দেবতা হচ্ছেন করম গোঁসাই।"[৫] (পৃ-৯৩)

ড. করণের ধারণা ও বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম বা শস্যের জন্ম উৎসব হলো জাওয়া। এটিই উৎসবটির মূল তাৎপর্য তা উভয় গবেষক স্বীকারও করেছেন। বিভিন্ন গবেষকের মতামত প্রসঙ্গটি সমাপ্ত করার পূর্বে আন্তর্জাতিক লোক গবেষক ড. ভট্টাচার্য বলেছেন-

> "বর্ষাকালীন একটি শস্য উৎসবের নাম জাওয়া পরব। ইহা সর্ষের জন্মোৎসব।"[৬] (পৃ-১২১)

এই সিদ্ধান্ত প্রায় সর্ব সম্মত। তাই এই বিষয়ে আর দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু এমন উৎসবের সঙ্গে ব্যক্তি, সমাজ, সংস্কৃতি, দেশ, কাল, আধ্যাত্মিকতা এমনকি মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির সম্পর্ক কি কোনো রয়েছে? নাকি এইগুলি নেহাতেই কোন লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান। আদিম মানুষের খামখেয়ালি কোন বিনোদন পার্বন? আমাদের মতে হাজার হাজার বছর ধরেই যে উৎসব লালিত-পালিত শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের সঙ্গে উদযাপিত হয় তা নেহাতেই আঞ্চলিক বিনোদন পার্বন হতে পারে না। মাটি, মানুষ, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতির নিগুঢ় তাৎপর্য এতে নিহীত থাকবে তা ভাবা যুক্তি সঙ্গত। কেবল তাই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিভিন্ন মানব জাতি গোষ্ঠী, ও সংস্কৃতির মধ্যে অনুরূপ কোন উৎসব রয়েছে কি-না, তাও অনুসন্ধান প্রয়োজন। যেটুকু জানা যায়, তাতে এমন পরিপূর্ণ আচার ও অনুষ্ঠান আর কোথাও নেই, কারও মধ্যেই নেই। আংশিক ও বিকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া যায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এমনকি সুদূর গ্রীস দেশেও। সে বিষয়ে প্রসঙ্গে আমরা পরে যাব। তবে আমাদের দাবি নৃবিজ্ঞানীদের অভিমত এবং সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকেই ভাবা যায় এই উৎসব হলো এক প্রাগ-ঐতিহাসিক বিশেষ ঘটনার নিশ্চিত স্মৃতি উৎসব। এই বিশেষ ঘটনাটি হলো কৃষির আবিষ্কার। সমাজ বিজ্ঞানীদের অনুমান তা ঘটেছিল ১০ থেকে ১৫ হাজার বৎসর পূর্বে। জাওয়া করম উৎসব ও ইতিহাস প্রসঙ্গে আমরা এখনই যেতে চায় না। এখন আমরা দেখে নেব কুড়মালি ভাষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পরম্পরা অনুসারে এটি কিসের উৎসব? প্রথমত: জাওয়া ও করম শব্দ দুটির কুড়মালি ভাষার দৃষ্টিতে অর্থ কি বোঝায়। কুড়মালি ভাষার শব্দ ভান্ডারের জি, জঅ, জিউ, জুআন, জওয়ান শব্দগুলি এবং জাওয়া শব্দের অর্থ প্রায় একই। জ বা জওয়া শব্দের অর্থ হয় জীবন, বাঁচা, নতুন চারার উদ্গম বা অঙ্কুরোদ্গম। ইংরেজিতে যাকে Germination বলা হয়। আর করম শব্দের সরাসরি অর্থ হলো কর্ম বা কাজ। আদিম মানুষের কর্ম বা কাজ বলতে একমাত্র কৃষিকেই বোঝাত।

সুপন্ডিত গবেষক গণ উৎসবটি কে শস্যোৎসব বা শস্যের অঙ্কুরোদ্গম উৎসব বলেছেন ঠিকই কিন্তু সেই আচারটি কেবল মাত্র এই অঞ্চলের মানুষেই করে কেন তা তারা ভাবেননি। আমাদের বিশ্বাস এই আচার বা অনুষ্ঠানটি হলো সেই প্রাচীন ঘটনারই স্মৃতি যেদিন মেয়েরা বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গমের রহস্যটি আবিষ্কার করেছিল ও কৃষির সূচনা করেছিল। এ কেবল কষ্ট কল্পিত কথার কথা নয় বা ভাবনার বিলাসও নয়। সমাজ বিজ্ঞানীদেরই অভিমত হলো মানব সভ্যতার ইতিহাসে কোন একদিন মেয়েরাই কৃষি আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু কে বা কারা এই কৃতিত্বের অধিকারী এর

সদুত্তর খুঁজে পাওয়া যায়নি। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিষয়টিকে বিচার করলে বলা যায় যারা আজও সেই স্মৃতি ও আচার-আচরণটি বহন করে চলেছে কৃতিত্বটি দিতে হবে তাদেরই।

কেবল কৃষির আবিষ্কারই নয় এই কুড়মালি কৃষি সংস্কৃতির অন্যতম লোক উৎসব 'সহরই-বাঁদনা' হলো কৃষির সহায়ক শক্তি গরু-কাড়ার সেবা, পূজা, আরাধনার উৎসব। বাঁদনা লোক পুরানে হাল-জোয়াল আবিষ্কার থেকে, গরু-কাড়াকে নিয়ে চাষের রীতি সমাজে কিভাবে সূচনা ঘটেছিল তার বিবরণ রয়েছে। তাই কৃষি আবিষ্কারের এই পরম্পরাটি যে সমাজে আজও লালিত পালিত হয় স্মৃতি আজও বেঁচে রয়েছে- এমতাবস্তায় জাওয়া-করমকে তাই কৃষি আবিষ্কারের স্মৃতি উৎসব বলে দাবি করাটা অযৌক্তিক হতে পারে না। সে কথা বলা হয়েছে, পরম্পরাগত জাওয়া গীতেও-

গীত:

"পহিলেহিঁ বেটি ছউআঞ পাতি দেলাঞ জাওয়া রে করম চলি আইল।
বসমতা মাঞেক করাঞ বিহিন বুনি দেলা রে করম চলি আইল।
কনে শিখলা আর কাকে শিখাই দেলা রে করম চলি আইল।
বসমতা মাঞেক করাঞ বিহিন বুনি দেলা রে করম চলি আইল।
বহিনে শিখলা আর ভাইকে শিখাই দেল রে করম চলি আইল।
বসমতা মাঞেক করাঞ বিহিন বুনি দেল রে করম চলি আইল।
কাকর করম আর কাকর ধরম রে করম চলি আইল।
বসমতা মাঞেক করাঞ বিহিন বুনি দেল রে করম চলি আইল।
বহিনেকর করম ভাইয়েকর ধরম রে করম চলি আইল।
বসমতা মাঞেক করাঞ বিহিন বুনি দেল রে করম চলি আইল।"[৭]

গীতে অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে উল্লেখিত রয়েছে যে, কোন একদিন এই বসমতা বা পৃথিবী মায়ের কোলে বীজ বপন করেছিল মেয়েরাই। আর সেই শিক্ষাটি তারা শিখিয়ে দিয়েছিল ভাইদের। কেবল দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার সমাজ নয়, সমগ্র মানব সমাজের তাৎপর্যটি নিহিত রয়েছে এই জাওয়া গীতে। আর মানুষ শস্য চারা গুলিকে ধনদেবী, আর করম বৃক্ষের পূজা আরাধনা থেকেই শুরু করেছিল প্রকৃতি পূজার।

শুরু হয়েছিল আধ্যাত্মিকতারও। করম ও ধরম মানব সভ্যতাকে দুটি মহত্ত্বম শব্দ ও দর্শন, উপহার দিয়েছিল এই কৃষি সংস্কৃতি এবং কৃষি সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন উৎসব জাওয়া-করম।

উৎস ও ইতিহাসের অনুসন্ধান:

জাওয়া-করম উৎসবের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যটি ভাবার চেষ্টা করেছেন গবেষকগন। সে চেষ্টা কিছু সফল কিছুটা অসফল তা উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু জাওয়া করমের উৎস, উদ্ভব ও ইতিহাস প্রসঙ্গটি সেভাবে ভাবেননি কেউই। আসলে এটিকে একটি ক্ষুদ্র জনপদের আদিম অশিক্ষিত মানুষের লোক মানস চর্চার অঙ্গ ও ফসল হিসেবেই মনে করেছেন। কিন্তু এই উৎসবগুলি যে নৃ-বিজ্ঞানের অংশ ও তাৎপর্য বহন করে চলেছে এমনটি ভাবেননি কেউই। এই প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের বিশিষ্ট লোক গবেষক কিরীটি মাহাত ব্যতিক্রমী ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন মানভূম কালচারাল আকাদেমি প্রকাশিত

> "মানভূমের জাওয়া করম পুস্তিকায় তিনি যা বলেছেন তা হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হল 'মানব ইতিহাসে কৃষির আবিষ্কার ছিল যুগান্তকারী ঘটনা। বলতে গেলে মানব সভ্যতার সূচনা ঘটে সেখান থেকেই। কৃষ্টি ও সংস্কৃতিরও জন্ম কৃষি থেকে সে কথা স্বীকার করেছেন সমাজ বিজ্ঞানীগণ। কৃষ্টি শব্দটি নাকি কৃষি শব্দ থেকেই এসেছে। কিন্তু এই বিশ্বে কৃষির সূচনা কোথায় হয়েছিল বা কে এর স্রষ্ঠা এর উত্তর দিতে পারেননি সমাজ বিজ্ঞানীগণ। কিন্তু ধারণা ও অনুমানের কথা তথা প্রাসঙ্গিতাকে ভিত্তি করে পন্ডিত গবেষকগণ যা বলেছেন তাও ভেবে দেখার বিষয়।"[৮] (২২ পৃষ্ঠা)

জাওয়া উৎসবের ভৌগলিক পরিধি:

আজকের দিনে জাওয়া-করম উৎসবের মূল কেন্দ্রভূমি হলো দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলা, উত্তর উড়িষ্যা সহ সমগ্র ঝাড়খন্ড, ছত্রিশগড়, উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, দিনাজপুর, মালদা, দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের কিছু অংশ আসাম এবং বাংলাদেশ। এই বৃহত্তর অঞ্চলে শুধুমাত্র জাওয়া-করম উৎসব পালিত হয় না, উৎসবের রুপটিও একই। এর কারণ যারা এই উৎসব পালন করে তারা বেশির ভাগ মানুষ রাঢ়-ঝাড়খন্ড ছোটনাগপুর থেকে চলে যাওয়া অভিবাসী মানুষ। যারা দু-শত আড়াই শত বৎসর পূর্বে এ অঞ্চল থেকে দেশান্তরীত হয়েছিল। এই উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে তারা আজও ধর্ম ও সংস্কৃতিকে পালন করে চলেছে। কিন্তু এতো গেল আজকের দিনের ভৌগোলিক পরিসীমাটি। কিন্তু প্রাগ-ঐতিহাসিক কালেই এই উৎসবটি যে ভারতের প্রায় সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আফগানিস্তানের আমুদরিয়া-সিরদরিয়া থেকে মেহরগড়, কুরুম নদী থেকে সিন্ধু-সরস্বতীর অববাহিকা অঞ্চলেই যে প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল এমন অনুমান করা যেতেই পারে। ড. অতুল সুর মনে করেছেন কৃষির সূচনার সময় কালেই শিবের আবির্ভাব ঘটেছিল। কিন্তু সেই স্থানটি কোথায় তা তিনি বলেননি। অমিশ ত্রিপাঠি তাঁর The Immortal of Meluha গ্রন্থে বলেছেন মেহেরগড়ে শিব প্রথম তার বসতি স্থাপন করেন।

প্রাচীনকালেই এই কৃষি সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল প্রায় সমগ্র ভারতে। তাই সমগ্র ভারতেই এক সময় মহা সাড়ম্বরেই উদযাপিত হতো এই জাওয়া করম উৎসব। বিভিন্ন অঞ্চলে আজও তার স্মৃতি বেঁচে রয়েছে এমন ইঙ্গিত করেছেন প্রখ্যাত পন্ডিত ক্ষিতিমোহন। তিনি তাঁর 'ভারত পরিক্রমা' গ্রন্থে বলেছেন-

> "..... তাহার পর পঞ্চমী হইতে সপ্তমীর মধ্যে নারীরা গাহিয়া বাজাইয়া নদীতে যাইয়া স্নান করিয়া নদীর মাটি লইয়া আসেন, তাহা পাত্রে রাখিয়া সপ্ত ব্রীহি দিয়া অঙ্কুর উদ্গম পর্যন্ত ভিজা কাপড়ে ঢাকিয়া রাখেন। ..... পাঞ্জাবে লোড়ি, গুজরাটে গবরা, হিন্দুস্থানী দেশে কজরী রূপে আছে। ধানের বীজ বুনিয়া তাহার নতুন শীষ লইয়া উৎসব করাতেই বোঝা যায়, এক সময় ইহা প্রাকৃত জনগণের মধ্যে নব ধান্য উদ্গমের সঙ্গে জড়িত ছিল।..... সুর নব অঙ্কুরের ন্যায় হরিদ বর্ণ। ভনিতা ও হরি হরি। বাংলা দেশ ছাড়া ভারতের সর্বত্র এই উৎসব আছে। নাই কেবল এই সরস সজল বাংলা।"[৯] (পৃষ্ঠা - ৩৯)

পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেই এই উৎসবের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন। বিষয়টি অনেক অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। কুড়মি অন্যতম প্রতিবেশী ও ঘনিষ্ট জনজাতি সাঁওতালদের জাতির উদ্ভব ও দেশান্তরের যে পুরা কাহিনী রয়েছে তাতেও বলা হয়েছে একদিন সাসাংবেড়ায় মারন্ডি বংশের লোকেরা করম ডাল মাটিতে পুঁতে, হাঁড়িয়া খেয়ে মনের আনন্দে নাচ গান করেছিল। কিন্তু বলা যেতেই পারে আজও নির্ধারিত হয়নি এই সাসাংবেড়া দেশ বা জায়গাটি কোথায়। কিন্তু এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় জাওয়া ও করম ডাল পোঁতার বিষয়টি অতি প্রাচীন এবং ভৌগোলিক পরিসরেও বহুদূর বিস্তৃত।

ড. সুধীর কুমার করনও অনুরূপ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর 'সীমান্ত বাংলার লোকযান' গ্রন্থে বলেছেন-

> "উত্তর বিহারের সারন জেলায় ব্রতচারিনীগন ভাদ্রপদী শুক্লপক্ষের একাদশীতে কর্মাধর্মার ব্রত পালন করে থাকে।"[১০] (পৃঃ ৯৫)

কৃষি বিষয়ক যে কোন পরব পালি বা লোক উৎসব সারা ভারতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে তা থাকায় স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়টি এইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। এর বিস্তৃতি ও ছায়া লক্ষ্য করা যায় সুদূর ইউরোপের গ্রীস দেশেও। এই প্রসঙ্গটির উত্থাপন করেছেন পুরুলিয়ার বিশিষ্ট গবেষক ড. নিমাই কৃষ্ণ মাহাত তাঁর 'মানভূমের কৃষি সংস্কৃতি' নিবন্ধে। তিনি বিখ্যাত পন্ডিত J.G. Frazer এর 'The Golden Bough' গ্রন্থে Garden of Adonis অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে যা বলা হয়েছে তার উল্লেখ করেছেন। বিবৃত বক্তব্যটি এই রকম-

> "..... Baskets of pots filled with earth, in which barely lettuces, fennel and various kinds of flowers were sown and tended for eight days, chiefly or exclusively by women, fostered by the Suns heat, the plants shoot up rapidly, but having no route they withered as rapidly ways, and at the end of 8 days were carried out with the image of the dead Adonis and flung with them into the Sea or into the Sprins."[১১] (পৃঃ ৪৪)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানভূম অঞ্চলের করম তথা জাওয়া পার্বনের সঙ্গে গ্রীসের 'Garden of Adonis' পার্বনের মূলগত সাদৃশ্য একই।

সুতরাং এও বলা যায় এটি হলো জাওয়া-করমের আন্তর্জাতিক যোগসূত্র বা বিস্তৃতির একটি বড় প্রমাণ। উপরোক্ত আলোচনা থেকে অন্তত: এটুকু বোঝা যায় বিষয়টি কেবলেই দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্ত বাংলা ঝাড়খন্ড ক্ষেত্রের মধ্যে উৎসবটি সীমাবদ্ধ নয়। তবে ক্ষিতিমোহন সেনের পর্যবেক্ষণ অনুসারেই উত্তর ভারত, বৃহত্তর মধ্য ভারত এবং পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলেই লোক উৎসবটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এই কৃষি সংস্কৃতি মানুষ জন যেখানেই রয়েছেন, সেখানেই জাওয়া-করম আজও অনুষ্ঠিত হয়। Golden Bough এর বিবরণ থেকেও বোঝা যায় কৃষি আবিষ্কারের কৃষিবিদ্যা যেমন সারা ইউরোপ এশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল তেমনি কৃষি বিষয়ক বিশ্বাস, সংস্কার, ভাষা, শব্দ, পরিভাষা, নেগ-নেগাচার, পরব পালি গুলিও ছড়িয়ে পড়েছিল এই অনুমান করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ দক্ষিণ ভারতের 'পঙ্গোল' উৎসবের কথা বলা যেতে পারে যা হুবহু সীমান্ত বাংলার বাঁদনা পরবের সঙ্গেই মিলে যায়।

আসলে মানব সভ্যতার এই বীজ অঙ্কুরোদ্গম ও কৃষি আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিটি ভারত বর্ষ এবং সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ছাড়িয়ে ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল ইউরোপেও। Garden of Adonis অনুষ্ঠানটি তারই সুনির্দিষ্ট প্রমাণ। সম্ভবত এই ঘটনাটি ঘটেছিল কুরুম থেকে সিন্ধু-সরস্বতীর অববাহিকা অঞ্চলেই ইতিহাসের কোন প্রাচীন মুহূর্তে। অমিশ ত্রিপাঠির দাবি মেহরগড়েই শিব প্রথম তার ঘাঁটি তৈরী করেন। এই দাবিটির পক্ষেই পৃথিবী বিখ্যাত মানব বিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গান মত প্রকাশ করেছেন তাঁর 'এনসিয়েন্ট স্যোসাইটি' গ্রন্থে যে ইউফ্রেটিস নদীর অববাহিকা, ভারত ও এশিয়ার স্টেপ অঞ্চল সমূহে; পশুকে পোষ মানানোর ফলে এক নতুন জীবন যাত্রা শুরু হয়।

কুড়মালি কৃষি উৎসব বাঁদনা লোক পূরান কথাতে, কৈলাস থেকে শিবের আগমন এবং গাই-গরুকে ঘরে ঘরে দিয়ে কৃষি কাজের যে সূচনার কাহিনী রয়েছে গবেষকদের কথা তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। যদিও বিশিষ্ট ধর্মগুরু পন্ডিত আনন্দ মুর্তিজি ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর মতে এই কৃষি সভ্যতা সংস্কৃতির আনুমানিক কাল ৭৫০০-৮০০০ বছর। তাঁর কথায় পশ্চিম রাঢ়ে হাল বলদের সাহায্যে এরা কৃষি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন বলে অন্যেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মহাত্মন বলে সম্বোধন করতেন যা পরবর্তীকালে শব্দটি হয়ে দাঁড়িয়েছে মাহাত। কুড়মি মাহাত গোষ্ঠীর সভ্যতা অন্ততপক্ষে ৭০০০ বছরের প্রাচীন। কৃষির আবিষ্কার ও কৃষি সভ্যতা বিকাশে কুড়মি সহ এই অঞ্চলের বিভিন্ন জনজাতি গুলির অবদান রয়েছে এই সকল বক্তব্য থেকে তা বোঝা যায়।

জাওয়া-করম পরবের নেগ-নেগাচার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস সংস্কার:

জাওয়া-করম পুরোপুরি একটি কৃষি উৎসব। এই উৎসবের পুর্ণ এক্তিয়ার ও অধিকার মেয়েদের। বিশেষ করে অবিবাহিত কুমারী মেয়েদের। তবে বয়স্ক ও প্রবীণ নারীরাও এতে পূর্ণ সহযোগিতা করে এবং নানাভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। ছেলেদের বা পুরুষের কোন ভূমিকা এই উৎসবে নাই তা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়। ভাদর বা ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে করম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব সৃষ্টির উৎস যেমন সূর্য তেমনি সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টির জননী হলো নারী। আদিম মানুষের প্রাথমিক যে দুটি কামনা; নারীর অন্তরে স্থান পেয়েছিল তার একটি অবশ্যই সন্তান এবং অপরটি শস্য। আমাদের বিশ্বাস সন্তান যেমন নারীর দিয়ে ছিল মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, তেমনি নারীই দিয়েছিল শস্য। তার শ্রেষ্ঠ প্রমান এই জাওয়া-করম উৎসব।

লক্ষণীয় বিষয় এই উৎসব কুমারী মেয়েদের এবং জাওয়ার সমস্ত নেগাচার তাদের জন্যে হলেও এই জাওয়া চারা গুলিকে তারা নিজে সন্তান বলেই মনে করে। এবং পুরো ৭ দিন বা ৯ দিন সন্তানের লালন-পালনে মা যে বা যেমন আচার-আচরণ নিয়ম-কানুন মেনে চলে-করমরিতা ও তাই পালন করে। তাই যারা জাওয়া পাতে তারাকে বলা হয় জাওয়ার মাঞ। আর এইরকম পালন করার জন্য বলা হয় করমতি। এই কুমারী মেয়েরাই যে কোন একদিন বীজ থেকে অঙ্কুর বা জাওয়া সৃজনের বৈজ্ঞানিক সত্যটি আবিষ্কার করেছিল তার প্রমাণ এই জাওয়া মাঞ বিশেষনটি। একটি কুমারী মেয়েকে মা বলার তাৎপর্যটি এই অতীত সৃষ্টি বা বীজ থেকে চারা জন্ম দেওয়ার ইঙ্গিতটিই নিহিত রয়েছে। তাই জাওয়া-করমের নেগ-নেগাচার গুলি হলো সম্পূর্ণ একটি সন্তানবতী মায়ের নেগ-নেগাচার। একটি জাওয়া বা চারার সঙ্গে তার সম্পর্ক মা ও সন্তানের। এখানে উদ্ভিদ ও শস্যের নয়। এরপর আমরা দেখে নেব সেই পালনীয় নেগ-নেগাচার গুলি কেমন।

নেগ-নেগাচার:

১। একাদশী তিথি থেকে ৭ দিন বা ৯ দিন পূর্বেই জাওয়া উঠা বা জাওয়া পাতা অনুষ্ঠানটি হয়। ঐদিন মেয়েরা উপবাসী থেকে দলবেঁধে ঘাটে গিয়ে এই জাওয়া পাতার কাজটি করে।

২। প্রথমে তেল সাবান ব্যবহার না করে পূর্ব দিকে মুখ করে এক ডুবে স্নান করতে হয়।

৩। এরপর ভিজে কাপড়ে তেল হলুদ বাঁটা ও দাঁতন কাঠি রেখে আঁজলা জল দিয়ে সূর্য দেবতা এবং পূর্বপুরুষ কে স্মরণ ও প্রণাম করতে হয়।

৪। ঘাট থেকে বালি সংগ্রহ করে বাঁশের তৈরী ডালাতে ভরতে হবে।

৫। বালি দেয়া হলে ৯,৭,৫ বা ১১ প্রকারের শস্য বীজ তাতে পুঁতে দিতে হবে।

৬। এরপর জাওয়া ডালির উপরে বা বীজের উপরে হলুদ জল ছিঁটে দেয়া হয়।

৭। যেটি মূল বা প্রধান ডালা তার মধ্যিখানে একটি ধানের গাছি পুঁতে দিতে হয়।।

৮। অন্য ডালা গুলি ছোট ছোট শালের ডাল পোঁতার নিয়ম।

৯। মাহামাঞ ও সূর্য দেবতাকে ঝিঙা পাতার উপর হলুদ বাঁটা ও দাঁতন দিয়ে গড় করতে হয়।

১০। জাওয়া পাতার পর ঘাটের পাড়ে পরিষ্কার একটি জায়গাতে সমস্ত ডালা গুলিকে একসাথে গোল করে রেখে তার চারিদিক ঘিরে মেয়েরা হাত ধরা ধরি করে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত ক্রমে জাওয়া গীত ও জাওয়া নাচ নাচতে হয়। কেউ কেউ বলেন আঢ়াই পাক নাচার নিয়ম আবার এই নিয়মের ভঙ্গও দেখা যায়। অর্থাৎ এমন মনের আনন্দে যতক্ষণ খুশি মেয়েরা গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে।

১১। এরপর গ্রামের চারিদিকে যে সকল গ্রাম দেবতারা অধিষ্ঠান করেন সেখানেও জাওয়া ডালি নিয়ে যাওয়া হয় ও গীত নৃত্য পরিবেশন করার নিয়ম। তবে সকল থানে না হলেও গরাম ও জাহিরা থানে তা করা বাধ্যতা মূলক। এরপর গ্রামে প্রবেশ করে যেখানে প্রতিদিন নাচের জন্য আখড়া তৈরী করা হয় সেখানে কিছু ক্ষণ নেচে ডালা গুলি বাড়ির ভিতরে ঘরের মেঝেতে পিঁড়ির উপরে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়।

জাওয়ার প্রকারভেদ:

অঞ্চল ভেদে কিছু পার্থক্য থাকলেও জাওয়া মোটামুটি পাঁচ প্রকারের হয়। যেমন- ১। সাঁচি জাওয়া, ২। মাচি জাওয়া, ৩। গরাম জাওয়া, ৪। বাগাল জাওয়া, ৫। বন জাওয়া।

সাঁচি জাওয়া: সাঁচি কথাটি এসেছে সম্ভবত সচ বা সাঁচা শব্দ থেকে। কুড়মালি ভাষাতে সাঁচা শব্দের অর্থ প্রকৃত সত্য বা মূল। এই জাওয়ার গুরুত্ব সবার উপরে মান্যতাও সবার উপরে। ৯ বছরের কম বয়সী মেয়েরা এই জাওয়া পাতায়। এই জাওয়া করম ঠাকুর ও সূর্যদেবতাকে নিবেদন করা হয়। সাঁচি জাওয়া রাখা হয় কোঠা ঘরে কিম্বা কোন সুরক্ষিত গুলুঙ্গিতে।

মাচি জাওয়া: মাচি জাওয়া যে কোনো বয়সী কুমারী মেয়ে অথবা বিবাহিত অপূত্রক মহিলাগনও এই জাওয়া পাতাতে পারে। একে সাধারণ জাওয়া বলা হয়। সাধারণত স্বামীর মঙ্গল কামনায় এই জাওয়া পাতা হয়।

বন জাওয়া: বন জাওয়ার অর্থ হলো পুরো প্রকৃতি অর্থাৎ বসমতা মাঞ, পাহাড় পর্বত, নদী নালা, ক্ষেত-বাইদ, বন জঙ্গল ও আকাশ, গ্রহ নক্ষত্র সবার উদ্দেশ্যে এই জাওয়া পাতা হয়। বাঁশের ডালা এর জন্য প্রয়োজন হয় না। সাধারণত শাল পাতার বঁহতা বা পাত্র তৈরী করে এই জাওয়া পাতা হয়। এর পিছনে যেমন প্রকৃতিকে খুশি ও আরাধনার বিষয়টি রয়েছে, তেমনি প্রকৃতি দেবতার কাছে বেশি ফসল কামনা ও এর পিছনে কারণ রয়েছে।

গরাম জাওয়া: গরাম দেবতা হলেন গ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা। তিনিই গ্রামের সবকিছুর রক্ষা কর্তা, পালন কর্তা। জমি জঙ্গল, রোগব্যাধি, মড়ক, বা অন্য সবকিছু বিপদ থেকে তিনি গ্রামকে বাঁচান। তাই তার উদ্দেশে দেওয়া হয় এই জাওয়া। শাল পাতা দিয়ে তৈরি খলা বা দনায় বালি এবং বীজ দিয়ে এই জাওয়া তৈরী করে গরাম দেবতার থানে তা রেখে দেওয়া হয়।

বাগাল জাওয়া: গ্রামের গরু কাড়া যারা কৃষি কাজে ব্যবহার হয় বা কৃষির সহায়ক শক্তি, তাদের দেখভাল ও রক্ষণাবেক্ষণ করে বাগাল বা রাখাল। তিনিও দেবতা হিসেবেই গণ্য হন। বাগাল জাওয়া তারেই উদ্দেশ্যে করা হয়।

শাল পাতার খালা বা দনা দিয়ে তার নিবেদন। মাঠে ঝোপ ঝাড়ের ভিতরে জাওয়া পাত্রটি রেখে দেওয়া হয়। আসলে গোরইয়া গুঁসাইকে খুশি করাও এর উদ্দেশ্যে।

জাওয়ার মাঞ বা করমতিদের পালনীয় নিয়ম বিধি:

১। বাসি টক দই জাতীয় খাবার নিষিদ্ধ। লোক বিশ্বাস এই জাতীয় খাবার খেলে জাওয়া ঢালিতে চারায় ছাতি বা ছত্রাক রোগ হয়। জাওয়া চারা গুলি এর ফলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

২। বেশি ঝাল জাতীয় খাবার বারন। সমাজে বিশ্বাস রয়েছে যে, ঝাল খাবার খেলে চারাগুলি ঝলসে যায়।

৩। খাওয়ার সময় বেশি গরম খাবার খাওয়া বারণ। গরম খাবার যেমন মুখ পোড়ায় তেমনি চারাগুলিও পুড়ে যেতে পারে।

৪। এই অঞ্চলের খাবারের সঙ্গে শাক বা শাগ তরকারি একটি নীত নৈমিত্তিক খাদ্য। কিন্তু করমতিদের তা বারণ। বিশ্বাস রয়েছে এতে চারাগুলির রং শাকের মতো হয়ে যায়। কিন্তু নিয়ম রয়েছে জাওয়ার রং হবে হলুদ। এজন্য শাক নিষিদ্ধ।

৫। মাছ-মাংস খাওয়া বারণ। মাছ-মাংস গুরু পাক খাদ্য। তাই সাবধানতা। করমতিদের অবলম্বন হওয়া চলবে না। পেট খারাপের ও ভয়। আসলে মাঞের শরীর অসুস্থ হলে তার প্রভাব সন্তানের উপর পড়বেই তাই এই সতর্কতা। করমতির শরীর খারাপ হলে চারাও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সতর্কতা তাই সবকিছুতে।

৬। গুড় খাওয়া বারণ। গুড় খেলে পিঁপড়ে পতঙ্গের আগমন স্বাভাবিক এবং তা চারাকে খেয়ে ফেলবে বা ক্ষতি করবে।

৭। পড়া জিনিস তা যে কোন প্রকার হোক সে খাদ্য খাওয়া ও নিষিদ্ধ। কোন জিনিস পুড়ে গেলে যেমনটি হয় বা রং ধারণ করে মানুষের বিশ্বাস রয়েছে চারা গুলিও পুড়ে যাওয়ার মতো হয়।

৮। ঝগড়া করা কিম্বা মুখে অশোভন, ও আমার্জনীয় কথা বলাও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে সদা সর্বদা তাদের সচেতন থাকতে হয়। বিষয়টি একেবারেই মনস্তাত্ত্বিক। তা জাওয়া ডালির চারা গুলিতে কিভাবে তার প্রভাব পড়ে তা অনুসন্ধান কষ্টসাধ্য। কিন্তু উদ্ভিদের বাঁচা ও বৃদ্ধির উপর সংগীতের প্রভাব যে বিজ্ঞান সম্মত তা আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। কৃষি সংস্কৃতির মানুষের তা কিভাবে জানা বা বোধগম্য ছিল হাজার হাজার পূর্বেই তা বিস্ময়ের বিষয়। এর থেকে বোঝা যায় কথা, শব্দ, সুর তথা মনের ভাব যে উদ্ভিদের উপর ক্রিয়া করে তা বাস্তব সম্মত এবং বিজ্ঞান। জাওয়া চারা গুলি তাদের শস্য সন্তান কিন্তু পরবর্তী জীবনে তারাই যখন মা হবে তখন তার প্রভাব যে সন্তানের উপর পড়বে তা তাদের স্মরণে থাকবে। সুন্দর ও উন্নত সন্তানের জন্য যা বড়ই প্রয়োজন। জ্ঞান ও মানস চর্চার কোন পর্যায়ে উঠলে এইগুলি সমাজে রীতি নিয়ম হয়েছিল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আজকের সুসভ্য শিক্ষিত সমাজেও তা বিস্ময়ের বস্তু।

৯। কেবল ঝগড়া বা কলহ নয় রাগ বা অভিমান ও বারণ। চারা গুলির উপর তার প্রভাব পড়ে পড়ে মানুষ মনে করে।

১০। বাঁধে বা পুকুরে ডুবদিয়ে স্নান করা নিষিদ্ধ। করম পূজার দিন পর্যন্ত এই নিয়ম মেনে চলতে হয়। লোক বিশ্বাস এতে জাওয়ার চারা পচে-গলে যায়।

১১। পেছনে চুল খোলা অবস্থায় পেছন শুয়ে স্নান করা যায় না। এতে নাকি চুলের মতোই চারাগুলিও হয়ে পড়ে।

১২। গামছা দিয়ে চুল ঝাড়াও বারণ। গামছা দিয়ে চুল ঝাড়া হলে যেমন অনেক চুল ঝরে পড়ে তেমনি জাওয়া চারা গুলির পাতাও ঝরে পড়ে।

১৩। দেবস্থানে, ভিজা মাটিতে এবং যেখানে সেখানে পায়খানা করা একেবারে নিষিদ্ধ। সবদিক থেকেই চারাগুলির অমঙ্গল হয়। ভেজা মাটিতে পায়খানা করলে যেমন ভুসকা উঠে লোক রিসার্চ চারা গুলিতেও অনুরূপ ভুসকা উঠে যাবে। এবং চারা গুলিকে নষ্ট করে দেবে। তাহলে প্রশ্ন কিভাবে তারা পায়খানা করে। কারণ আজকের দিনের মতো পাকা টয়লেট তো সে যুগে ছিল না? তার উপায় স্বরূপ পায়খানা করতে গেলে পলাশ, শাল অথবা বড় আকৃতির কোন গাছের পাতা সংগ্রহ করে তাতে পায়খানা করে থাকে।

করম ডাল গাড়া ও করম পূজা:

জাওয়া-করম উৎসবের একটি মহত্বপূর্ণ আচার বা অনুষ্ঠান হলো করম রাজার পূজা। করম রাজা অর্থে করম ডালের পূজা। যে গাছ থেকে ডালটি সংগ্রহ করা হয় সেই গাছটিকে পূজার পূর্ব দিনেই গ্রামের লায়া আমন্ত্রণ জানাই। এই আমন্ত্রণের রীতিটি হলো করম গাছের গোড়ার গুঁড়ি, সিঁদুর, কাজল দেওয়া। এছাড়া আতপ চালের গুড়, ঘি, মধু

সহযোগ ভোগ নিবেদন করা। এবং প্রদীপ দেওয়া। পূজার দিন বাজ-বাজনা সহকারে গিয়ে গাছের গোড়ায় পুজো করে দুটি ডাল কেটে নিয়ে আসবেন। ডাল পূজার আখড়া যেখানে ঠিক করা হয় সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দুটি গর্ত করে ডাল দুটি পাশাপাশি পুঁতে দেয়া হয়। ডাল দুটি কার কার প্রতীক এই বিষয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন সূর্য ও বসমতা মায়ের প্রতিক কেউ বলেন বুঢ়া বাপ এবং মাহা মায়ের প্রতীক।

করমতিরা একটি করে বাঁশের তৈরী ডালাতে তাদের পূজার সারভার বা সামগ্রী নিয়ে সন্ধ্যায় করম আখড়ায় এসে উপস্থিত হয়। এবং ডালকে বেষ্টন করে ডালের চারিদিকে বসে। সারাদিন তারা উপাস থাকে। সন্ধ্যায় স্নান করে তাল তোলে আসে। লায়া এক এক ঝাড় বা গোষ্ঠীর মেয়ে বউদের একসঙ্গে বসিয়ে পূজা করে। পূজার পর মেয়েরা করম ডালকে প্রণাম ও কোল-আঁকড় (আলিঙ্গন) করে। করমতি মেয়েটি নিজের ভাইয়ের বাহুতে সুতোতে কাঁখনা ঘাস ও জাওয়া চারা বেঁধে দাগা বেঁধে দেয়। এবং করম ঠাকুরের কাছে গীতে গীতে প্রার্থনা করে বলে- 'আপন করম-ভাইয়ের ধরম'।

গীত:

"দেহু দেহু করম রাজা দেহু আশিসরে
ভইআ মর বাঢ়ত লাখ বরিস রে
দেবোঁ তো করমতি দেবো আশীষ গো
ভইআ তর বাঢ়ত লাখ বরিস।"[১২]

করম ডাল পূজার মধ্যে কয়েকটি গভীর তত্ত্ব নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। জাওয়া-করম যদি হয় কৃষির সূচনার স্মৃতি উৎসব তাহলে করম ডালের পূজা আরাধনা প্রকৃতি পূজার আদিম নিদর্শন বলে ভাবা যেতে পারে। মানব সভ্যতায় আজ যতগুলি ধর্ম মত ও সম্প্রদায় রয়েছে তার আদি হলো প্রকৃতি পূজা। এই আদিম কৃষি উৎসবটি তার প্রথম নিদর্শন বলে অনুমিত হয়।

ইঁদ ও ইঁদ পূজা: জাওয়া-করম পরবের শেষ পর্বটি হলো ইঁদ পূজা। দ্বাদশী তিথিতে বিকাল বেলা বহু গ্রামে ইঁদ টাঁইড়ে ইঁদ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। একটি লম্বা বাঁশের ডগায় ছাতার কাঠামোতে সাদা কাপড়ের থান দিয়ে তা ঢাকা থাকে। ইঁদ ডাং এর গোড়ার দিক মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তাতে ঢুকিয়ে দিয়ে স্থানীয় গ্রামের মাহাত, মড়ল রাজা এবং উপস্থিত জনতা হাতে হাত মিলিয়ে দড়িতে টান দিয়ে ইঁদ ডাঁগকে আকাশে তোলা হয়। লায়া ইঁদ দেবতাকে পূজা দেয় সেই ডালের গোড়ায়। সমবেত জনতা ইঁদ দেবতার কাছে শস্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে জোড় হাতে প্রণাম জানাই। আর করমতী মেয়ে তাদের জাওয়া ডালির কিছু চারা সঙ্গে নিয়ে আসে এবং ইঁদ দেবতার দিকে আকাশে ছুঁড়ে দেয়।

কিন্তু কে এই ইঁদ দেবতা? এই নিয়ে পন্ডিত মহলেও বিবাদ ও বিতর্কের শেষ নেই। বেশির ভাগ পন্ডিত মনে করেন এটি ইন্দ্রধ্বজের পূজা অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা আরাধনার প্রতীক। এক সময় ভারতের বৃহত্তর অংশে এই পূজার প্রচলন ছিল। কিন্তু তাদের বিষয়টি একেবারেই লৌকিক এবং করম ডালের মতো এটিও প্রকৃতি পূজা। আর এই ইঁদ রাজা ইন্দ্র নন তিনি হলেন প্রকৃতির রাজা সূর্য। কারণ 'ভারতের দেব-দেবী' গ্রন্থে হংশ নারায়ণ ভট্টাচার্য সূর্যের ১০৮ নামের একটি নাম কে ইঁদ বলেছেন।

কৃষি সংস্কৃতির আদিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দেবরাজ ইন্দ্রের কোন সামাজিক বা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নেই। সম্পর্কটি সূর্যের সঙ্গে। শস্যের উৎপাদন ও মঙ্গল কামনায় বৃষ্টির দেবতা সূর্যের কাছে পূজা আরাধনা ইঁদ পূজা বা পরবের মূল তাৎপর্য। লোক উৎসবের সামাজিক, আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যটিকে উপেক্ষা করে ব্যাখ্যা বিপথে পরিচালিত করতে বাধ্য।

স্পষ্টতঃ সে কথায় বলে গেছেন আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যা নিধি তার 'পূজা পার্বণ' গ্রন্থে। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তার 'পূজা পার্বণ' গ্রন্থে। তিনি ইঁদকে ইন্দ্র ধ্বজের পূজা বলেই মনে করেছেন। পঞ্জিকাতে 'শক্রোত্থান' নামে এর অভিধা। এই বিশেষ তিথিতে ইঁদ পূজার কারণ ও তিনি নির্দেশ করেছেন জ্যোতিষের প্রমাণ সূত্রে। কোন এক কালে জৈষ্ঠ মাসের শুক্ল নবমীতে মহা বিষুব হয়েছিল। তার তিন মাস তিন তিথি পরে ভাদ্র মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে সূর্যের দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়েছিল। (ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য)

বিভিন্ন রাজারা একে কেন্দ্র করে ইন্দ্রধ্বজ পূজা উৎসব আয়োজন করেছিলেন। এই ভাবেই ইঁদ ইন্দ্রধ্বজে রূপান্তরীত হয়েছিল। আসল তাৎপর্যটি সূর্যের দক্ষিণায়নের যাত্রা। তার স্মৃতি ও পূজা হলো ইঁদ অর্থাৎ সূর্যের পূজা। যার উত্তরায়ণ যাত্রার পর্বটি হলো আখান। কৃষি উৎসব গুলির তাৎপর্য সবই জ্যোতিষ ও বিজ্ঞান আধারিত এবং সম্মত। তাই সেভাবেই তার ব্যাখ্যা হওয়া প্রয়োজন। আসল তাৎপর্যটি হারিয়ে গেলে, সংস্কৃতির চেতনা ও শিক্ষাও বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

তথ্যসূত্র:

১. সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ। ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান গ্রন্থ (মুদ্রিত)। প্রকাশনী মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১, ১৩৭৮, পৃ. ১৮।
২. ক্ষেত্র, সমীক্ষা। পুনুড়িয়া নগেন, বয়স ৭০, টিমাংদা, কোটশীলা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
৩. মাহাত, ড. বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য (মুদ্রিত)। প্রকাশনী বানী শিল্প, ১৯৭৮, পৃ. ৫৭।
৪. মাহাত, ড. বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য (মুদ্রিত)। প্রকাশনী বানী শিল্প, ১৯৭৮, পৃ. ৫৭।
৫. করন, ড. সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোকযান। করুনা প্রকাশ, ১৪০২, পৃ. ৯৩।
৬. করন, ড. সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোকযান। করুনা প্রকাশ, ১৪০২, পৃ. ১২১।
৭. ক্ষেত্র, সমীক্ষা ও মাহাত সরস্বতী। বয়স ৩৫, উশিড, চেলিয়ামা, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ।
৮. মানভূম কালচার একাডেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, ২০২৩, পৃ. ২২,২৯।
৯. সেন, ক্ষিতিমোহন। ভারত পরিক্রমা (মুদ্রিত)। প্রকাশনী পুনশ্চ, ২০০৪, পৃ. ৩৯।
১০. করন, ড. সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোকযান (মুদ্রিত)। পৃ. ৯৫।
১১. মাহাত, নিমাই কৃষ্ণ। মানভূমের কৃষি সংস্কৃতি। J.G. Frazer, The Golden Bough. পৃ. ৪৪।
১২. মাহাত, কিরিটি। জাওয়া ডালি। মুলকী কুড়মালি ভাখি বাইসি (মুদ্রিত), ২০২৪, পৃ. ৩৪।

আকর গ্রন্থ:

১. করন, ড. সুধীর কুমার। সীমান্ত বাংলার লোকযান। করুনা প্রকাশ, ১৪০২।
২. মাহাত, ড. বঙ্কিম। ঝাড়খণ্ডের লোকসাহিত্য (মুদ্রিত)। প্রকাশনী বানী শিল্প, ১৯৭৮।
৩. সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ। ঝাড়খণ্ডী লোকভাষার গান গ্রন্থ (মুদ্রিত)। প্রকাশনী মুক্তধারা, ৭৪ ফরাসগঞ্জ, ঢাকা-১, ১৩৭৮।

অন্যান্য ঋণ:

১. মাহাত, কিরিটি। জাওয়া ডালি। মুলকী কুড়মালি ভাখি বাইসি (মুদ্রিত), ২০২৪।